সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ঃ ধারণাগত রূপ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া

আবদুল্লাহ্ ফারুক *

১. গবেষণার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

আদি কাল থেকেই মানুষ সত্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছে। প্রকৃতিতে নানা ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা ঘটে যা দেখা যায় বা অনুভব করা যায়। কিন্তু এসব ঘটনা (phenomenon) কেন ঘটে বা কিভাবে ঘটে, এই ব্যাখ্যা আমাদের কাছে শুধু ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয় না। মানুষ কৌতুহলী – ঘটনাগুলি কেমন করে ঘটে, কিভাবে তা রোধ করা যাবে (যদি তা অবাঞ্ছিত হয়) অথবা কি করলে তা আরো বেশী করে ঘটানো যাবে (যদি তা আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়) –মানব মনের এই জানবার আকাঙ্খা বা কৌতুহল থেকেই সত্যের অনুসন্ধানের বা সত্য আবিষ্কারের প্রক্রিয়া চলে আসছে। আদিকালে মনে করা হতো সত্য আবিষ্কার সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কেন কি হচ্ছে বা ঘটছে তা তারাই জানতে পারে যারা ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষভাবে নির্বাচিত। অপরদেরকে তা বিশ্বাস করতে হয় বা মেনে নিতে হয়। এখনো আমাদের সমাজে দেখা যায় গণক, ওঝা, ইত্যাদিদের যারা রোগ, দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত দেয়। যদি জানতে চান, তারা কেমন করে এসব প্রচ্ছন্ন সত্য জানতে পারলো, তারা কোন পরিষ্কার উত্তর দিতে চায় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ বা গোপন সাধনা তাদের সত্য জানার ক্ষমতা দিয়েছে, এমন একটা বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সে কালে চালু ছিল। গবেষণার উদ্দেশ্যও সেই সত্যের অনুসন্ধান (Investigation) এবং ফলাফল হিসাবে তত্ত্বের (Theory) প্রতিষ্ঠা। যদি বৈজ্ঞানিক পন্থা (Scientific Methods) প্রয়োগ করে এই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়, তাকেই আমরা গবেষণা (Research) বলবো। এক কথায়, যদি কোন ঘটনা কেন ঘটছে, কেমন করে ঘটছে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাই, সেটাই হলো গবেষণা। এটা কোন অসাধারণ বা অতি লৌকিক পদ্ধতি নয়। এতে কোন গোপনীয়তা নাই। প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষ যে

* *অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

প্রক্রিয়ায় সত্য আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, সেই পদ্ধতিটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে পরিচিত। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের যে জানবার কৌতূহল, তা জ্ঞানের নানা শাখাতে হতে পারে। তা পদার্থ সম্পর্কে হতে পারে, তা বস্তুর রাসায়নিক গুণ সম্পর্কে হতে পারে, প্রাণীর জীবন সম্পর্কে হতে পারে, সমাজে মানুষের চাল–চলন সম্পর্কে হতে পারে। কিন্তু একালে সভ্য মানুষের কাছে জ্ঞান অনুসন্ধানের গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি একটিই, তা সে পদার্থ বিজ্ঞানেই হোক, আর সামাজিক বিজ্ঞানেই হোক। বলা বাহুল্য সেই সত্য অনুসন্ধানের একক পদ্ধতির নামই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়া কেউ যদি কোন ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়, তা উপন্যাস হতে পারে, কাব্য হতে পারে, ধর্মমত হতে পারে, তাতে আমরা উপকৃতও হতে পারি, কিন্তু তাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলা যাবে না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ গোড়ার দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Sciences) শাখাগুলোতেই বেশী সার্থকতা লাভ করেছে। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সেখানে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কোন পর্দাথের বা প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা (Experimentation) অথবা চলকগুলির সংজ্ঞায়ন (Defining the variables) ঐ সকল ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম জটিল ছিল। কিন্তু সামাজিক বা মানবিক ঘটনাবলী বা সমস্যাগুলির সংজ্ঞায়ন বা তা নিয়ে তথ্য সংকলন ছিল অনেক বেশী জটিল। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় – এক বোতল বাতাসকে কতটা চাপ দিলে তা কি পরিমাণে সংকুচিত হবে এবং কতটা তাপ দিলে তা কতটা সম্প্রসারিত হবে, তা পরীক্ষাগারে (Laboratory) বার বার পরীক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু সমাজে কার ছেলে মেয়ে ভাল স্বভাবের হবে এবং কারা অপরাধী হয়ে যাবে, কিভাবে মানুষের মন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপখাওয়াতে (Adjustment) পারবে, এটা নিয়ে পরীক্ষা করা সহজ নয়। কারণ মানুষ যন্ত্র বা জড় পদার্থ নয়। মানুষ বা তার সমাজ নিয়ে পরীক্ষা করার নৈতিক অধিকার সমাজ দেবে কিনা, এ প্রশ্নও আছে। তবুও এখন আমরা ক্রমশ সে দিকেও অনেক অগ্রসর হচ্ছি, আর তাই, যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়ম কানুন আগে সামাজিক সমস্যায় ব্যবহার করা হতো না, তাতেও আমরা এখন ক্রমশ ঐ পদ্ধতি দ্বারা নতুন তথ্য আবিষ্কার করছি। তবে হ্যাঁ, আমাদের পরীক্ষার পদ্ধতির নতুনত্ব রয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল নীতিগুলি এখানেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে অনেক পুরাতন বিশ্বাসকে হয় প্রমাণিত সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, নয়তো তা কোন ব্যক্তির অনুমান বা বিশেষ সময়ের এবং পারিপার্শ্বিকতার জন্য সত্য ছিল বলে এখন তা বাতিল করা হচ্ছে। যেহেতু সামাজিক সমস্যাবলীর অনেক প্রশ্নেরই উত্তর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পাওয়া যাচ্ছে, তাই এখন আমরা এই শাস্ত্রকে সামাজিক বিজ্ঞান (Social Sciences) নাম দিচ্ছি। এতে রয়েছে অর্থনীতি (Economics), সমাজ বিজ্ঞান (Sociology), মনোবিজ্ঞান (Psychology), ইতিহাস (History), অপরাধ বিজ্ঞান (Criminology) এবং এই গুলির মিশ্রণের দ্বারা পাওয়া অনেক নতুন নতুন জ্ঞানের শাখা। কিন্তু এ পর্যন্ত আলোচনায় বারে বারে যে 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির' কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ কি,

তার সংজ্ঞা কি বা সর্তগুলি কি, তা এখনো বলা হয়নি। এইবার সেই আলোচনায় যাওয়া যাক।

২. বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method) কি ?

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আদত কথা এমন কতকগুলি নিয়ম এবং শৃংখলার সমষ্টি, যেগুলি কোন অজানা প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে ব্যবহার করলে আমাদের উপসংহার প্রমাণিত সত্য বলে সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ এতে ভ্রান্তির বা ঠকে যাবার সম্ভাবনা কম। যুক্তি বিদ্যার (Logic) যখন ক্রমশ উন্নতি হলো, তখন দেখা গেল অনেক কিছুই যা দৃশত সত্য বলে মনে হয়, তা পরীক্ষা পদ্ধতিতে টেকে না। যেমন, চকও সাদা আবার পনীরও সাদা। কিন্তু সাদা বলেই আমরা চক্‌কে যেন পনীর বলে ভুল না করি, এমন একটা যুক্তিজাল থেকে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নিয়মাবলী গড়ে উঠেছে। এই যুক্তি শাস্ত্রের আদি পিতা ছিলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস, যিনি খৃষ্টের জন্মের চারশো বছর আগে মানুষকে তর্ক করতে শেখান। তাই এক হিসাবে আমরা তাঁকেই এই শাস্ত্রের জনক বলতে পারি। কোন ঘটনা কেন ঘটছে, এ বিষয়ে অনেকেই অনুমান করে থাকেন, কিন্তু এই অনুমানে কোথায় গলদ রয়েছে, তা শুধু ঐ অনুমানকে সন্দেহ করে, সেখানে যুক্তির মধ্যে কোন ফাঁক আছে কিনা তা চিন্তার দ্বারা এবং অপর সকলের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলেই সত্য অনুসন্ধান সার্থকতার দিকে এগুতে পারে; এই সন্দেহ করাটাই সক্রেটিসেরঅবদান।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান যখন অনেকটা এগিয়ে গেল, সেই সময় সংখ্যা বিজ্ঞান (Statistics) নামে একটা শাস্ত্রের উদ্ভব হয়। এই শাস্ত্রের কাজ হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন, তাকে একটা নিয়ম শৃংখলার মধ্যে আনা এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে প্যেঁছানো। যে বিষয়ে সব তথ্য পাওয়া যায়না বা সংগ্রহ করা খুব ব্যয় বহুল, সেই বিষয়ে কম খরচে অথচ যুক্তিপূর্ণ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর উপায় হিসাবে অংক শাস্ত্রের একটি অবদান 'সম্ভাব্যতার পরিমাপ' (Calculus of Probability) বিজ্ঞানীরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করলেন এবং তাতে দেখা গেল সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক সমস্যাকেই এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আওতায় এনে কিছু সমাধান দেওয়া যাচ্ছে। এই প্রসংগ সংখ্যা বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু এবং এর নাম নমুনা চয়ন পদ্ধতি (Sampling Technigue), কার্ল পিয়ারসন নামক একজন সংখ্যা বিজ্ঞানী তার গ্রন্থ গ্রামার অব সায়েন্সে (Grammar of Science) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেন যা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি।[১] কার্ল পিয়ারসনের দেওয়া সেই সংজ্ঞা সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষকদের জন্য যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পলিন ইয়ং এবং তাঁর গ্রন্থ সামাজিক বিজ্ঞানীদের জন্য একটি উত্তম পাঠ্য।[২]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা তাহলে কি? যে প্রশ্নটার উত্তর আমরা পেতে চাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাইলে তার প্রথম ধাপ হলো উত্তর সম্পর্কে প্রথমে আমাদের

একটা অনুমান (Hypothesis) করে নিতে হবে। এই অনুমান করতে হলে যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন; সমস্যাটি সম্পর্কে আগে যাঁরা চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, তাঁদের সিদ্ধান্ত সমুহ (Findings) জানা দরকার এবং সে গুলির কোথায় যুক্তির অভাব রয়েছে, অসম্পূর্ণতা রয়েছে তা ভাল করে বুঝে নিয়ে, আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্যের (Objectives of research) সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে অনুমান করা দরকার। আবার অনুমানটা এমন হতে হবে, যা পরীক্ষার জন্য যে সব তথ্য প্রয়োজন, তা যেন সংগ্রহ করা এবং বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। তা না হলে ঐ অনুমান আমাদের গবেষনায় কোন কাজে লাগবেনা। উদাহরণ হিসাবে মনে করা যাক, স্মাগ্লিং (Smuggling) বা চোরা চালান হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে আমরা জানতে চাই। কিন্তু এই কাজটা যদি এতই গোপনে করা হয় যে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন তথ্যই কেউ দিতে পারছে না, তাহলে ঐ বিষয়ে গবেষণা করা মুস্কিল। সামাজিক বিজ্ঞানে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যে ক্ষেত্রে আমরা সমস্যাটা অনুভব করি কিন্তু তথ্য হিসাবে কোথাও কোন কথা পাওয়া যায়না। নারী পুরুষের যৌন সম্পর্ক এমনই আর একটি প্রসঙ্গ যা সমাজে প্রকাশ্যে আলোচিত হবার কোন নিয়ম নাই। তাই এই সব জটিল বিষয়ে অনুমান, তথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা পাওয়া গবেষণার পরিমান এখনো খুব কম। যাই হোক, প্রথম পদক্ষেপ হলো, গবেষণার প্রশ্নটির সম্ভাব্য উত্তর পম্পর্কে অতীতের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে একটি বা একাধিক অনুমান প্রস্তুত করা (Formulation of Working Hypothesis)। তার আগে অবশ্য আমাদের ব্যবহৃত কথাগুলিকে সংজ্ঞায়ীত করতে হবে। অনেক কথাই সমাজে ব্যবহার হয় একাধিক অর্থে বা অর্থহীনভাবে। কিন্তু গবেষণার অনুমান প্রস্ততের জন্য সেই কথাগুলিকেই আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ অর্থে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। একটি লোক সুখে আছে না দুঃখে আছে, কি করলে তার সুখ বৃদ্ধি হবে, দুঃখ হ্রাস পাবে, এটাই যদি গবেষকের কাজের বিষয় হয় তা হলে প্রথমে 'সুখ' কথাটাকে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। এটা কি সহজ? ভেবে দেখুন – সুখ কোন একক অর্থে সবার জন্য সত্য হতে পরেনা। টাকা না থাকার দুঃখ রয়েছে, কিন্তু টাকা থাকলেও মনের সুখ নাও থাকতে পারে যদি পরিবারিক শান্তি না থাকে। আবার পারিবারিক শান্তি থাকলেও যদি সমাজের দূর্নীতির কারণে আমার যোগ্যতার পুরস্কার না দেওয়া হয়, তাহলেও আমি অসুখী হতে পারি। শারীরিক কোন অসুবিধা থাকলে সেটাও মানুষের অসুখী হবার কারণ হতে পারে। সাধারণতঃ এমন ক্ষেত্রে গবেষক তার 'অনুমান' প্রস্তুতের জন্য একটা সীমাবদ্ধ সংজ্ঞা ব্যবহার করেণ। সেই সংজ্ঞা তাঁর প্রকল্পের (Project Aim) লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। যদি আর্থিক অর্থেই সুখী বা অসুখী নির্ণয় করা আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সুখের অন্যান্য দিক গুলিবাদ দিয়ে আমাদের কাজ চালানোর মতো একটা সংজ্ঞা (Operational Definition) ব্যবহার করতে হবে। তাই এমন হতে পারে যে কোন কথাকে তার প্রচলিত অর্থের থেকে ভিন্ন কিন্তু বোধগম্য একটা অর্থে এই অপারেশনাল ডেফিনিশন ব্যবহার করতে হবে। 'অনুমান' এমন হতে হবে যা গবেষক পরীক্ষার দ্বারা সত্য অথবা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে পারে। এই কজে আমাদের এমন

তথ্য সংগ্রহ বা সংকলন করতে হবে, যা সাজিয়ে সংখ্যা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ছকে ফেললে আমরা অনুমান (Hypothcsis) গ্রহণ বা বাতিল (Null hypothesis) করতে পারি।। সংখ্যাতাত্ত্বিক এই নিয়মগুলির মধ্যে রয়েছে দুই বা তদোধিক চলকের মধ্যে এক সাথে বাড়া বা কমার সম্পর্ক (correlation) অথবা অন্য কোন ধরনের সম্পর্ক, সময়ের সাথে চলকের বাড়া কমার চিত্র (Trend study in a time series) ইত্যাদি। এগুলি এখানে আলোচনা করা হলো না, যদিও সংখ্যা তত্ত্বের বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Statistical Techniques) সামাজিক বিজ্ঞানের সকল গবেষককেই পৃথকভাবে জেনে নিতে হয়। 'অনুমান' প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজন গবেষকের সৃজনশীল চিন্তাধারা (Creative Thinking) এবং কল্পনাশক্তি (Imagination)। 'অনুমান' পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ছকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে যা থেকে সংখ্যা তাত্ত্বিক ছকে সাজানো উপাত্ত থেকে যুক্তির মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে, অনুমানটা গ্রহণ করা বা বাতিল করা সঙ্গত কিনা। বাংলাদেশ অঞ্চলে, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ১৯৬১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন হুসেন এবং ফারুক কর্তৃক সম্পন্ন Social Integration of Industrial Workers in Khulna নামক কাজটি।[৩] এখানে সমস্যা ছিল, খুলনায় প্রতিষ্ঠিত নতুন বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে কেন ঘন ঘন দাঙ্গা এবং শ্রমিক অসন্তোষ হচ্ছে? ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে দাঙ্গাগুলি সাধারণত যে দুই দল শ্রমিকের মধ্যে ঘটতো, তার একদল ছিল বিহার থেকে আগত মোহাজেয় শ্রেণী আর দ্বিতীয় দলটি ছিল স্থানীয় বাঙ্গালী, যারা বহিরাগতদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কারণ বিহারীদের কারখানার কাজে পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল। গবেষণার 'অনুমান' ছিল যে এই দুটি দল পরস্পরের সাথে মিশতো না। ফলে একের সম্পর্কে অপরের অনেক ভুল ধারণা ছিল। এই ভুল ধারণা থেকে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব সৃষ্টি হয়, যার ফলে শুরু হয় মারাত্মক দাঙ্গা। যদি একদল অপরদলের সাথে মিশ্তো, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং সামাজিক লেন দেন ঘটতো, তাহলে এধরনের দাঙ্গা হবার সম্ভাবনা থাকতো না, কারণ উভয় দলই ছিল নিতান্ত দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণী, যাদের একদল মালিকের সহানুভূতি পেত, আর–একদল স্থানীয় সরকারের সমর্থন পেত। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করার পর তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ঐ অনুমান সত্য ছিল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ হলো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ এবং নথিবদ্ধ করা (Observation, Collection and Recordiing of Data)। পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ বেশ জটিল কাজ। বাহ্যিকভাবে দেখলে যে অবস্থা দেখা যাবে, তাতে আসল কার্যকারণ সম্পর্কটা পরিষ্কার নাও হতে পারে। খুলনার গবেষণার কথা ধরা যাক, সকল শ্রমিককেই জিজ্ঞাসা করলে দেখা যেত, তারা যে শোষিত হচ্ছে, তা হয় মালিক পক্ষের নয়তো সরকারের বিমাতা সুলভআচরণের কারণে। তারা কেউউ মনের আসল আক্রোশটা প্রাথমিক আলাপে হয়তো বলতে চাইবে না। প্রশ্নের মাধ্যমে এমন কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল যা আপাতদৃষ্টিতে তাদের আর্থিক দুর্দশার সাথে সম্পর্কিত ছিল না। প্রশ্নগুলিও গবেষণা কাজের প্রয়োজন যাতে মেটে এমন হওয়া চাই।

প্রশ্নটা যাতে ঐ শ্রমিকদের পক্ষে বোধগম্য হয় এবং তাদের চিন্তায় যাতে উত্তরটা আসে, এমন হতে হবে। উত্তরগুলি যাতে একটা গাণিতিক ছাঁচে 'বেশী থেকে কম' এইভাবে সাজানো যায় (arranging in a sequence) তা দেখতে হবে। কেউ যদি কাউকে পছন্দ না করে, তা কোন প্রশ্নের উত্তর থেকে এমন ভাবে জানা যাবে, যাতে উত্তর গুলি থেকে পছন্দ বা অপছন্দের তীব্রতা অনুসারে সাজানো যায়। এই সমস্যাটা মুলত একটা পরিমাপ যন্ত্র প্রস্তুতের (Scaling teahnique) সমস্যা। পছন্দ একটা গুণগত চলক (Qualitative variable), কিন্তু পরিমাপ ছকের মাধ্যমে একে একটা–মানগত চলকে (quantitative variable) রূপান্তর করা হয়। যদি গবেষক অপর কারো প্রস্তুত স্কেলে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যুক্তি সঙ্গত মনে না করেন, সে ক্ষেত্রে তাঁর নিজের প্রয়োজনীয় স্কেল উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তুত করে নিতে হবে। সামাজিক বিষয়ক চলক (Sociometry) প্রস্তুত করার বিশেষ নিয়ম কানুন রয়েছে এবং তা প্রস্তুতের নিয়মাবলী আলোচিত হয়েছে অনেক গ্রন্থেই, যার মধ্যে একটি গ্রন্থ Reaearch Method in Social Relations। [৪] যে সব স্কেল অপর গবেষকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক পর্যায়ে সেইগুলি ব্যবহার করলে স্কেল প্রস্তুতের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। অনেক সময় কোন ঘটনা সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন না করে শুধু ঘটনাটা দেখে তা লিখে নেওয়া যায় (observation)। আবার কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে গবেষকের অনুমান যাচাইয়ের জন্য একটা বাস্তব পরীক্ষাও করা যায় (Experimentation)। একটি খুচরা দোকানে দিনে কতজন ক্রেতা আসে, এ বিষয়ে দোকানের মালিককে প্রশ্ন করার চেয়ে দোকানের এক কোণে বসে সারা দিন লক্ষ্য করলে তাকে অবসার্ভেশন মেথড বলা যায়। পরীক্ষার পদ্ধতি সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বেশী নাই। কারণ মানুষ গবেষকের ইচ্ছামত পরীক্ষার বিষয়বস্তু হলে তার ব্যবহার স্বাভাবিক নাও হতে পারে। বাংলাদেশের একটি অর্থনৈতিক গবেষণায় এই ধরনের পরীক্ষা করা হয়েছিল, উদাহরণ হিসাবে তার উল্লেখ করা যায়। [৫] Irrigation in a Monsoon Land নামক গবেষণার বিবেচ্য বিষয় ছিল কৃষির ক্ষেতে যদি বাহির থেকে পানি সরবরাহ করা যায়, তাহলে কতটা ফসল বেশী হয়, কত খরচ হয় এবং কারা এই কাজে অধিক সফল হয়। এই গবেষণায় কাছাকাছি দুটি ইউনিয়ন বেছে নেওয়া হয়, যার একটিতে গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্প থেকে পানি সরবরাহ হয়, অপরটিতে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে আগে থেকে যতটা বিচার করা সম্ভব, পানি সরবরাহ না করা ইউনিয়নটি অপর ইউনিয়নের মতই ছিল। তারপর দুই ইউনিয়নেই এক বৎসর ধরে ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নির্বাচিত (randum sample) কৃষকদের নিকট থেকে চাষের খরচ এবং ফলন আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মনে রাখতে হবে সকল ক্ষেত্রে গবেষণার অনুমান প্রমাণ করার জন্য ইন্টারভিউ বা অবসার্ভেশন দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সমস্যার কথা ধরা যাক। দেশে বা কোন অঞ্চলে বিশেষ ধরনের সামাজিক অনাচার বা ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে, কমছে, অথবা একই রকম আছে? অতীতের সম্পর্কে তথ্য কারো মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু তথ্যটা যদি

এমন হয়, যা সরকার সব সময় সংগ্রহ করছেন এবং তা কোন গ্রন্থে ছাপানো হচ্ছে, তাহলে যদি গবেষকের সংজ্ঞার সাথে ঐ সংগৃহীত তথ্যের সংজ্ঞা একই রকম হয়, তবে ঐ তথ্যগুলি একটি কাল সারণী (Time Series) হিসাবে সাজিয়ে তা সংখ্যা বিজ্ঞানের নিয়মে বিশ্লেষণ করা যায়, যেমন জন সংখ্যা বা দ্রব্য মূল্যের তথ্য। কিন্তু এমন ঘটনা হতে পারে যার তথ্য কোথাও টাইম সিরিজ হিসাবে তৈরী করা নাই – যেমন চাকুরীর বাজার বা বাসস্থান সংগ্রহের সমস্যা। এই ধরনের সমস্যায় গবেষক অনেক সময় অতীতের প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকায় দেওয়া 'কর্মখালি' অথবা 'বাড়ি ভাড়া'র বিজ্ঞাপনের তথ্য নির্দিষ্ট ছকে এবং সংজ্ঞা অনুসারে তালিকাভুক্ত (Tabulation) করে তা সংখ্যা তত্ত্বের নিয়মে বিশ্লেষণ করতে পারেন। এই ধরনের গবেষণা পদ্ধতির নাম কন্টেন্ট–এনালিসিস্ (Content Analysis)। অতীতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অনেক সমস্যাতেই আমরা কনটেন্ট এনালিসিস্ করতে পারি। বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে অন্তত একটি কাজ হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ষাটের দশকের শেষে, জামান, ইসলাম এবং ফারুক কর্তৃক।[৬] এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তার সীমাবদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে অনেক গ্রন্থেই। এখানে বেরেলসনের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়।[৭]

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির তৃতীয় কাজটি হলো সংগৃহীত তথ্য বিভাজন এবং তা মানের ক্রম অনুসারে সাজান (Classfication of Recorded Data into Series and or Sequence)। কোন ঘটনাকে গবেষণার প্রয়োজনে বিভাজন করার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিবিষ্ট চিন্তার প্রয়োজন। স্কুলের পাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় যেমন রসায়নের প্রথম পাঠ হলো যাবতীয় বস্তুর রাসায়নিক গুণ অনুসারে প্রথমে মৌলিক (elements) এবং যৌগিক পদার্থে (compounds) ভাগ করা। আবার প্রাথমিক উপাদানগুলিকে ধাতু এবং অধাতু (metals and non metals) এইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। তেমনই পদার্থ বিজ্ঞানে সকল পদার্থকে প্রয়োজনের জন্যই কঠিন পদার্থ (solid), তরল পদার্থ (liquid) এবং বায়বীয় রূপে (gas) ভাগ করা হয়, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠেই বৃক্ষকে তার বিভিন্ন প্রকৃতি, মূল, কান্ড বা স্বভাব অনুসারে ভাগ করা হয়, তেমনি সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণাতে মানুষকে তার পারিবারিক অবস্থান অনুসারে স্ত্রী, পুরুষ, বিবাহিত, অবিবাহিত, ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, ভাষা অনুযায়ী ইংরেজ, ফরাসী বা জার্মান ইত্যাদি নানাভাবে ভাগ করা যায়। এই বিভাজন প্রয়োজন হয় আমাদের 'অনুমান' গুলির পরীক্ষার সুবিধার জন্য। ধরা যাক, আমরা অনুমান করছি যে যারা যত বেশী পরিশ্রম করে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তত ভাল হবে। এজন্য প্রথমে প্রত্যেক মানুষকে ভাগ করতে হবে স্ত্রী, পুরুষ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক (ছাত্র), প্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ (কর্মক্ষম নয়) এমন ধরণের শ্রেণীতে। তারপর তাকে ভাগ করতে হবে তার অর্থনৈতিক অবস্থা বা বাৎসরিক আয় অনুসারে টাকার অংকে। তারপর তাকে ভাগ করতে হবে সে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যহ কত ঘন্টা কাজ করেছে। সেইভাবে ঘন্টা হিসাবে। প্রত্যেকটি পরিবার সদস্যের এই ভাগের ফলে একটি পরিমাপ পাওয়া যাবে। এখন তথ্যগুলি সংখ্যা তত্ত্বের ছকে সাজালে দেখা যাবে (হয়ত) যারা বেশী পরিশ্রম করছে, তাদের আয় অপরদের চেয়ে

বেশী। এ থেকে প্রমাণ করা যাবে যে এই সকল সংজ্ঞা অনুসারে সংগ্রহ করা তথ্য অনুযায়ী বেশী পরিশ্রমের সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার একটা সরাসরি (positive association) সম্পর্ক রয়েছে। আবার এর বিপরীতটাও হতে পারে। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৬ সনে সমাপ্ত একটি গবেষণায় এই প্রশ্নে দেখা গিয়েছে যে যারা যতবেশী পরিশ্রম করে, তাদের আর্থিক অবস্থা তত খারাপ। এই অপ্রত্যাশিত ফল হবার অবশ্য কারণ এই যে মানুষের আয় এবং পরিবারের জীবন ধারনের মান নির্দ্ধারিত হয় তার পরিশ্রম ছাড়াও পুঁজি, শিক্ষা, দক্ষতা, ইত্যাদি সম্পদের দ্বারা। তাই এ ক্ষেত্রে গবেষণার অনুমান ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।[৮] সংক্ষেপে কোন বস্তুর বা ঘটনার মধ্যে বিবেচ্য প্রশ্নটির সমাধানের উপযোগী ভাবে গুণের কি কি মৌলিক মিল (essential similarities) অথবা গড়মিল (dissimilarities) রয়েছে, একই ধরনের গুণের সমাহার রয়েছে (clusters of related factors) যা বারবার পাওয়া যাচ্ছে পরিমাপের সময় এবং ঘটনায় স্বাভাবিক ক্রমের পুনরাবৃত্তি (recurring natural sequence of events), এই উপাদান গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই গবেষক নির্ণয় করতে পারেন, কেন কোন ঘটনা ঘটছে বা কি করলে ঐ ঘটনা আর ঘটবে না, ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ কেন কোন কোন শিশু অপ্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধী (delinquent) হয়ে থাকে, এই বিষয়ে গবেষকরা অনুমান করেন যে, যে সকল পরিবারে পিতামাতার স্নেহ ছিল না, পিতামাতারা পৃথক হয়ে গিয়েছে বা তাদের কোন একজন বেঁচে নাই, এই ধরনের বালক বালিকা যদি শৈশবে স্নেহের বদলে নির্দয় ব্যবহার পেয়ে থাকে, তারাই এমন অপরাধ করে থাকে যা আইনের চোখে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য একটি অপরাধ। এখানে যারা ডেলিংকোয়েন্ট হিসাবে শাস্তি পাচ্ছে তাদের পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে তার সাথে ভাল ছেলে মেয়েদের পরিবার সম্পর্কে ঐ একই রকম শ্রেণীবদ্ধ তথ্য সংগ্রহ এবং সারীবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করলে অনুমানটা সঠিক অথবা সঠিক নয়, এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চতুর্থ ধাপ হলো তথ্য বিশ্লেষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কতগুলি ধারনা-সংজ্ঞার নির্মাণ (Scientific generalisation and formulation of Concepts)। ধারনা-সংজ্ঞার নির্মাণ হলো, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রথম এবং সবচেয়ে সরল কাজ। একটু খুলে বলা যাক, যদি প্রশ্নটা এমন হয় যে সমাজে যাদের আয় বেশী, তাদের সন্তানরা ভাল ছাত্র হয় কিনা? এই প্রশ্নে প্রথমত জানতে হবে একজন মানুষের আয় কত? তারপর জানতে হবে সন্তানের ভাল ছাত্র হবার লক্ষণ কোন তথ্য থেকে পাওয়া যাবে? সমাজে কথা দুটি অনেক ক্ষেত্রেই নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু গবেষক যখন তা ব্যবহার করবে তথ্য সংগ্রহের জন্য, তখন তাকে একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে হবে। আয় বলতে যদি মাসের বেতন বুঝায় এবং ভাল ছাত্রের লক্ষণ যদি তার কোন পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর বুঝায়, তাহলে গবেষণার সময় দেখা যাবে অনেকেরই মাসিক বেতনে যা, তার চেয়ে তার প্রকৃত আয় বেশী বা কম ছিল। আবার পরীক্ষার নম্বর নানা ফিকিরে বাড়ানো যায়, স্কুলে স্কুলে নম্বর পরস্পর তুল্য নয়।

তাই গবেষককে প্রায়ই কাজ শুরু করে, এমনকি কাজের শেষে এসেও ঐ প্রচলিত কথাটা তার নিজের গবেষণায় কি সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করতে হয়েছে তা পরিবর্তন করতে হতে পারে। তাই ধারণা–সংজ্ঞা যা দেওয়া হলো, তা অনেক সময়ই সাধারণ ভাবে সমাজে ব্যবহৃত ঐ কথাটার প্রচলিত অর্থ থেকে ভিন্ন হতে পারে।

এর পর আসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। আমরা তথ্য থেকে যে পারস্পরিক কার্য কারণের ধারণা পাই, সেটাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু অনেক সময়ই আমরা আংশিক সত্যকে সম্পূর্ণ সত্য বলে ভুল করতে পারি। শিশু অপরাধীদের বেলায় হয়তো দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন শহরে বা পরিবেশে ঐ সম্পর্কের বিভিন্নতা রয়েছে – অর্থাৎ যেখানে পরিবেশটা অধিক নির্দয় বা অপরাধ প্রবণ সেখানে ভগ্ন–পরিবারের সন্তান যেমন অপরাধ প্রবণ হচ্ছে, ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সন্তান প্রাথমিক অবস্থা এক রকম হলেও তা হচ্ছেনা। মানুষের ব্যবহার এবং সামাজিক কার্য কারণ সম্পর্ক এতই জটিল, সেখানে চলকের সংখ্যা এত বেশী যে প্রায়ই দেখা যায় আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ তথ্য বিশ্লেষণে যে তত্ত্ব (Theory) পেয়েছি, ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন চলক কার্যকর হবার ফলে সেখানে ঐ সূত্র অচল। যদি কোন সূত্র বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং সময়ে পরীক্ষার ফলেও সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তখন তাকে আমরা একটা সূত্র (Law) বলতে পারি। বিশ্লেষণে প্রত্যেক মুহূর্তেই গবেষককে চিন্তা করতে হবে, সে সত্য আবিষ্কারের কাজে ঠকে যাচ্ছে কিনা, তার আবিষ্কৃত তত্ত্বটা সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষায় টেকে কিনা, অপর কোন সূত্রে পাওয়া ধারণা বা বর্ণনার সাথে মেলে কিনা। গবেষককে শুধু পরিশ্রমী হলেই চলবে না, তাকে কল্পনা–শক্তির (imaginativeness) ব্যবহার এবং নিজের পূর্ব ধারণা (bias) এড়িয়ে চলতে হবে এবং নিজের কাজ সম্পর্কে সন্দেহ প্রবণ (fault-finding) স্বভাবের হতে হবে। না হলে প্রায়ই দেখা যাবে গবেষক এমনভাবে তাঁর 'কনসেপ্ট' তৈরী করেছিলেন, তাঁর পরীক্ষাটা সাজিয়েছিলেন (design of the experiment), যাতে তিনি যে তথ্য পেয়েছেন তা থেকে তাঁর করা সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। এক কথায় আত্ম–সমালোচনা (Self-Criticism) এবং গবেষণা লব্ধ তত্ত্বের সমর্থনে স্বতন্ত্র নজির (Independent Check) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির একটি অপরিহার্য্য অংশ।

৩. গবেষণার আনুষঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়

আর্থ–সামাজিক গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ একটি সাম্প্রতিক ব্যাপার যার বয়স প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগের চেয়ে অনেক কম। মানুষের সমস্যা, তার মন এবং তার সামাজিক চাল–চালন নিয়ে গবেষণা করতে হলে প্রথমেই যে জটিলতা দেখা দেয়, তা হলো ঐ প্রসঙ্গের চলকগুলির সংখ্যাধিক্য। প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের জৈবিক প্রকৃতি এক হলেও ভিন্নভিন্ন সমাজে ভিন্ন রকম মানসিকতা, সামাজিক আচার–ব্যবহার, নিয়ম–কানুন এবং পারিপার্শ্বিকের সাথে খাপ–খাওয়ানোর ইতিহাস গড়ে

উঠেছে। এগুলিকে যদি চলক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তা হলে তার সংখ্যা এত অধিক হয় যে তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ খুবই ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। তথ্য সীমিত হলে বা তা প্রতিনিধিত্বমূলক না হলে (non-representative of the population under study) গবেষণা লব্ধ তত্ত্বের চেয়ে তার ব্যতিক্রমই বেশী হয়ে পড়ে, তাই তা কাজে লাগে না। অধিক সংখ্যক চলক নিয়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক বা বীজগাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সকল অঙ্ক কষার প্রয়োজন হয়, তা কার্য্য ক্ষেত্রে শুধু সাম্প্রতিক কালে কম্পুটার আবিষ্কারের পরেই সম্ভব হয়েছে, আগে কৌশলটা জানা থাকলেও সে জন্য পরিশ্রম ছিল অসম্ভব রকম ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত সামাজিক বিজ্ঞানের অনেকগুলি চলকই অনুভব করা যায়, কিন্তু তাকে গবেষণার জন্য সংজ্ঞায়িত করা সহজ কাজ নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অর্থনীতিতে অনেক সময়ই আমরা জীবন–ধারণের মান কথাটা ব্যবহার করে থাকি বটে, কিন্তু একটি চলকের দ্বারা তার পরিমাপ করতে গেলে যে সমস্যা হয়, তা এই যে কোন একটি জিনিসের দ্বারা যেমন আমাদের প্রয়োজন মেটে না, তেমনই সব শ্রেণীর লোক একই রকম জিনিস ব্যবহার করেনা। তাহলে সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের ব্যয় বাড়ছে না কমছে, এটা বুঝবো কি করে? আবার যদি কারো স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব মাপতে হয়, সেখানেও কোন একটি গুণের মাপ দিয়ে আমাদের কাজ চলে না। এই সমস্যার সমাধান সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকরা যেভাবে করে থাকে, তাহলো কয়েকটি জিনিষের মূল্য বা স্বভাব বা চেহারার কয়েকটি চলকের একত্রীকরণের পর তা দিয়ে একটা সূচক (Index Number) প্রস্তুত করা। এজন্য প্রথমে একটা কন্‌সেপ্ট তৈরী করে নিতে হয়। সংখ্যা তত্ত্বে এই 'সূচক' পরিমাপের উপায় বর্ণনা করা আছে। মানুষের অর্থনৈতিক বা সামাজিক অনেক সমস্যার তথ্যই কোন সরকার বা প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করে না। গবেষকের নিজস্ব প্রয়োজন মত প্রথমে সংজ্ঞা এবং ধারণা (Concept) প্রস্তুত করে নিয়ে তার পর যাদের বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে। তাদের নিকট থেকে প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে উত্তর হিসাবে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তার শ্রেণী বিন্যাস করে বিশ্লেষণ করতে হয়। গবেষণার এই বিশেষ পদ্ধতির নাম জরিপ পদ্ধতি (Survey Method)। সার্ভে পদ্ধতির নিয়ম এবং মতামতের মূল্যায়ন যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা বের করতে হয়, সে ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, তা অনেক গ্রন্থেই আলোচনা করা হয়েছে, Milard Parten এর গ্রন্থটি তার অন্যতম।[৯] প্রশ্ন করে তার জবাব হিসাবে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা কাজে লাগে, যদি যে অর্থে প্রশ্নটা করা হয়েছে, উত্তরদাতাও কথাটা বুঝে নিয়ে তার মতামত বা অবস্থা সেই অর্থেই দিতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ই উত্তরদাতা প্রশ্নটা বুঝতে পারেনা, বুঝলেও উত্তরটা প্রকাশ্যে বলতে চায়না বা উত্তরটা তার চিন্তাতেই আসেনা। সে ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহারের অযোগ্য। একবার বাংলাদেশে কারখানা শ্রমিকদের নিজের কাজে তারা কতটা সন্তুষ্ট এবং কোন পেশা তাদের সবচেয়ে বেশী পছন্দ এই বিষয়ে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম নারায়ণগঞ্জের এক পাট কলে। একজন মধ্য বয়সী শ্রমিককে প্রশ্ন করা হলো, "যদি এই কারখানার কাজই আপনার সবচেয়ে ভাল না মনে হয়, তবে কোন ধরনের জীবিকা বা

পেশা আপনার সবচেয়ে বেশী পছন্দ, তা ভেবে বলুন।" উত্তরদাতা একটু চিন্তা করে উত্তর দিলঃ "আমি তো অন্য কোন কাজের খবর রাখিনা, তা আপনি নিজেই ভেবে চিন্তে আমার জন্য যা ভাল মনে করেন, সেই কাজটাই লিখে নিন।" এই উত্তর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে উত্তরদাতার কোন ধারণা নাই। তাই তাকে যে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে, উত্তর থেকে তা পাওয়া গেল না। আবার কারো যৌন অভ্যাস সম্পর্কে যদি কোন প্রশ্ন করা হয়, উত্তর দাতা মনে করতে পারে যে সত্য কথাটা প্রকাশ করলে প্রশ্নকারী তথা সমাজ তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। তাই সে সত্য কথাটা স্বীকার নাও করতে পারে। এটাও ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে পৌছানোর পথে একটি বাধা। প্রশ্নপত্রের সাহায্যে ইন্টারভিউ–এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করায় অনেক বাধা আছে। এগুলি ভাল করে না জেনে নিলে ইন্টারভিউ করা সার্থক নাও হতে পারে। এই সমস্যার আলোচনা করা আছে–Kahn & Cannell এর গ্রন্থে। [১০]

সামাজিক বিজ্ঞানের নানা শাখা রয়েছে, যেমন অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস; এবং অনেক গবেষণাতেই সমস্যার বিশ্লেষণটা একক ভাবে কোন বিশেষ শাখাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং একাধিক শাখার মিশ্রণ (Interdisciplinary) হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার প্রাথমিক পর্যায়ে অধিক প্রয়োগ হয়েছিল অর্থনীতি শাস্ত্রে। কারণ বিভিন্ন দেশের সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাটা বুঝতে চেয়েছেন, উন্নয়নের জন্য সেই জ্ঞান প্রয়োগ করতে চেয়েছেন এবং এজন্য সরকারী দপ্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণা কর্মের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। জাতীয় আয় (National Income) কিভাবে পরিমাপ করা যায়, কিভাবে তা বৃদ্ধি পায় এবং কেন কোন কোন জাতি অপরদের চেয়ে অধিক উন্নতি করেছে, এই সব প্রশ্নে সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারেরই বিপুল আগ্রহ ছিল এবং আছে বলেই এই ক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ তরান্বিত হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে, তবে ছাত্রদের পঠনের জন্য Ferber and Verdoom এর গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। [১১] বাংলাদেশের জাতীয় আয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের বর্তমান পদ্ধতি এবং তার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে ১৯৯০ সনে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় আয় 'কমিশনের প্রতিবেদনে।' [১২]

সমাজ বিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট উন্নত হয়েছে বিশেষ ভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে মার্কিন সৈনিকদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মানসিক এবং সামাজিক খাপ খাওয়ানোর সমস্যাবলী (Adjustment during army life) সম্পর্কে গবেষণার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয়ের ফলে।[১৩] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রে যখন নিত্যব্যবহার্য পণ্যের ব্যাপক উৎপাদনের ফলে তা খরিদ্দারদের মধ্যে অধিক পরিমাণে বিপণণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন ব্যবসায়ীরা নিজেদের আর্থিক স্বার্থে খরিদ্দাররা কিভাবে এবং কেন জিনিসপত্র ক্রয় করে, কিভাবে তাদের প্রভাবিত করা যায় এনিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানের অনেক বিখ্যাত অধ্যাপক এই সময়ে

তাঁদের ব্যক্তিগত গবেষণা প্রতিষ্ঠান খুলে দেন, যে গুলিকে বিপণণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Marketing Research Organisation) অথবা মতামত জরিপ প্রতিষ্ঠান (Opinion Research Business) চালু করেন। প্রিন্সটনের অধ্যাপক ডিষ্টার এবং জর্জ গ্যালপ্ এদের অন্যতম। যেহেতু গবেষণায় অধিক পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ হয়, তাই ঐ সকল কাজের অন্যতম ফল হয়, সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতিতে অনেক নতুন অবদান।

সামাজিক বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল যে সকল বিষয়ে মানুষের মনের গভীরে কি চিন্তাধারা আছে, তা প্রকাশ করা। এজন্য পরোক্ষ পদ্ধতির ইন্টারভিউ (Projective Interviews) এই ভাবেই অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

৪. গবেষণালব্ধ তত্ত্বের যুক্তিযুক্ততা, বিশ্বস্ততা এবং চলক নির্মাণ

এখন সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করবো, যা প্রত্যেকেরই মনে রাখা দরকার। যে কোন প্রশ্নে যদি তথ্য বিশ্লেষণের পর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়, তা সাধারণত দুই ধরনের বিচারের সম্মুখীন হবে। প্রথমটিকে বলা যায় যুক্তিযুক্ততার (Validation) মাপকাঠি। অর্থাৎ আমি যে যুক্তির দ্বারা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি, সেই যুক্তিতে কোন গোঁজামিল নাই তো? উদাহরণ স্বরূপ যদি গবেষণার অনুমানটা এই হয় যে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে কিনা? এখন সংগ্রহ করা তথ্যের ভিত্তি যদি এমন হয় যে প্রশ্নটা ছিল এমন ঃ "আপনি কি মনে করেন যে এখন লোকের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়েছে?" আর উত্তরে শতকরা ৯৫ জন লোক 'হ্যাঁ' বলেছে। এখানে যুক্তির মধ্যে যে ফাঁকিটা রয়েছে তা হলো ঃ মানুষের মতামতকে আমরা 'তথ্য' বলে ভুল করলাম। এখানে আমরা যা পেয়েছি তা হলো লোকে কি মনে করে, তাই। তাকে প্রকৃত অবস্থার পরিমাপ বা প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। অর্থাৎ এই যুক্তিটা ভ্যালিড্ হলো না বা ধোপে টিকলো না। দ্বিতীয় ধরনের বিচার হবে আমাদের তথ্যের বিশ্বস্ততা (Reliability) নিয়ে। অর্থাৎ গবেষক যা দেখেছেন বলে দাবী করছেন, সেই পরীক্ষাটা যদি আবার কেউ নতুন ভাবে করে, তখনো কি একই রকম তথ্য পাওয়া যাবে? গবেষণায় 'বিশ্বস্ততা' কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে। তা তার নির্বাচিত নমুনাগুলির নির্বাচন পদ্ধতির যৌক্তিকতা নিয়ে। উদাহরণ স্বরূপ, কেউ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রের বা তা একটি অংশের পরিবারের সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তা থেকে সারা বাংলাদেশের লোকের অবস্থা সম্পর্কে সে তথ্য পেয়েছে বলে দাবী করে, এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে? উত্তরটা 'না'। কারণ দেশের সকল পরিবারের একটা নমুনা চয়ন করলে তাদের অবস্থা হয়তো দেখা যাবে আমাদের পূর্বের তথ্য থেকে ভিন্ন। কারণ ঐ দুটি একই জনগোষ্ঠির থেকে লটারীর মাধ্যমে বাছাই করা

নমুনা নয়। বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হলো বার বার পছন্দ করা 'স্যাম্পেল' বা নমুনার মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে কিনা, এ বিষয়ের প্রমাণ। ভালো গবেষণাকে 'যুক্তির' (validity) এবং 'বিশ্বস্ততার' (reliability) পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

শেষে আর একটি সমস্যার কথা বলেই এই আলোচনা শেষ করবো। সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রায়ই এমন হয় যে তাতে সংখ্যাতত্ত্বের বা অঙ্ক শাস্ত্রের কোন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল ধারণা এককভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় বা যায়, সেগুলি প্রায়ই ভিন্ন সময়ে বা ভিন্ন পরিস্থিতিতেও একই অর্থে বুঝানো যায়। সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে তা প্রায়ই সম্ভব হয় না। আমরা যখন কাউকে জিজ্ঞাসা করি, "কেমন আছেন?" উত্তরে প্রায়ই বলা হয় "ভাল আছি" বা "মন্দ নয়"। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এই "ভাল থাকার" অর্থ এক নয়। সাধারণ কথোপকথনের জন্য যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, তার বহুরকম অর্থ হতে পারে। কিন্তু যখন সামাজিক বিজ্ঞানী সেই প্রচলিত সামাজিক কথোপকথন থেকেই তার পরীক্ষার জন্য মাল–মশলা বেছে নেন এবং ব্যবহার করেন, তাঁকে নানা অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ অর্থ পছন্দ করে নিতে হয়। অর্থাৎ একটা অস্পষ্ট অভিব্যক্তি বা কথাকে সামাজিক গবেষক একটি 'চলকে' রূপান্তরীত করে তার পরই তা সংখ্যাতাত্ত্বিক বা গাণিতিক ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করেন। এখানে মুখের কথাকে চলকে রূপান্তর করাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা বা কঠিন সমস্যা। মানুষের 'আয়', 'সুখ', 'দুঃখ' এই সব প্রচলিত বহুল ব্যবহৃত কথাকে যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছকে ফেলতে হয়, তখন তাকে একটা শৃংখলাপূর্ণ, সীমিত অর্থের সজ্ঞায় রূপান্তর করতে হবে। সেই "ধারণা" (Concept) যে কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, অন্য কাজের এবং উদ্দেশের জন্য তা ব্যবহার করা সঙ্গত নাও হতে পারে। এই সমস্যাটা আমাদের কাজের সময় সকলেরই মনে রাখা কর্তব্য।[১৪]

তথ্য নির্দেশ

১. Karl Pearson, *Grammar of Science* , (London : Adam and Charles Black 1900), Second Edition.

২. P. V. Young, *Scientific Social Surveys and Research* (Prentice Hall Inc. U. S. A. 1965).

৩. A. F. A. Husain *Social Integration of Industrial Workers in Khulna*, (Dhaka : Bureau of Economic Research, Dhaka University 1961)

৪. C. Sellitz, M. Jahoda, M. Duetsch, S. Cook, *Research Methods in Social* Relations, (New York : Holt, Rinehart and Winston 1959) pages 186-198.

৫. A. Farouk, *Irrigation in a Mosoon Land*, (Dhaka : Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1972)

৬. A. Farouk, A. N. M. Zaman, T. Islam, *Science Trained Manpower* (Dhaka : Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1972)

৭. B. Berlson, Content Analysis in Communication Research. (New York. Hafner Publishing Co. 1971)

৮. A. Farauk, M. Ali, *The Hardworking Poor* (A Surney on How People Use Their Time in Bangladesh) (Dhaka : Bureau of Economic Research, Dhaka University, 1977)

৯. M. Parten, *Surveys, Polls and Samples : Practical Procedures* (New York Harper & Bros. 1950,)

১০. R. L. Kahn, C. F. Cannell, *The Dynamics of Interviewing : Theory, Technique and Cases.* (New York : John Wiley & Sons. 1957)

১১. R. Ferber and P. Verdoorn, *Research Methods in Economics and Business* (New York : The Macmillan Co. 1962)

১২. *Report of the National Income Commission* (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, 1990).

১৩. S. A. Stouffer, et al. *Measurement and Prediction. Studies in Social Psychology in World War II.* Vol. I. (Princeton : Princeton University, U. S. A., 1949),

১৪. P. F. Lazarsfield and M. Rosenberg, *The Language of Social Research* (New York : The Free Press, 1967)